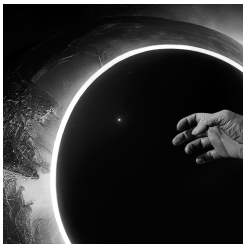

# তারা মিয়া ও নিউটনের আপেল

## লেখকের গ্রন্থসমূহ

**উপন্যাস**

কালপিয়াসী জ্যোৎস্না
তৎপুরুষ
মাখনের দেশলাই
নীল ফড়িং
শেষ ট্রেন

**কাব্যগ্রন্থ**

ফাগুন রঙা শব্দ
কালো জোছনায় লাল তারা
চলে এসো এক কাপড়ে
কস্মিনকালেও তুমি প্রেমী ছিলে না
এখনো প্রমিথিউস

সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস

# তারা মিয়া ও নিউটনের আপেল

আব্দুল্লাহ শুভ্র

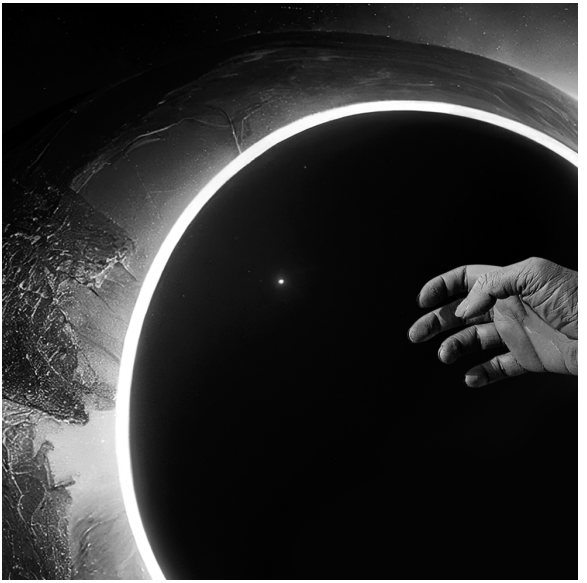

KOBI PROKASHANI

# তারা মিয়া ও নিউটনের আপেল

আব্দুল্লাহ শুভ্র

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে, বুকস অফ বেঙ্গল, বইবাংলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

---

Tara Mia O Neutoner Apple by Abdullah Shuvro Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-99841-6-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

আমার মা ‘শামসুন্নাহার’

কৃতজ্ঞতা

মোরশেদুল জাহের

## এক

সাতক্ষীরা শ্যামনগরের আঠারোবেকী মৌজা। এর দুই ধারে রায়মঙ্গল ও যমুনা নদী বয়ে গেছে।

কেওড়া, বাইন ও হেতালসহ বুনো গাছগাছালির ঘন গভীর জঙ্গল। সুন্দরবনের এই অংশটি শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে!

জঙ্গলের পাড় ঘেঁষে ছোট্ট একটি গ্রাম। বেশ কয়েকটি ঘর। বড় উঠোনসহ গোলপাতার ছাউনিতে তৈরি বড় ঘরটি লাল মিয়া গাজীর। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। ভাঙাচোরা শরীর।

খোদাভীরু লোক। স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র আট বছরের সুরুজ আলী ছাড়া আপনজন বলতে পরিবারে কেউ নেই। দশ-বারো বছর আগে বড় ছেলেকে নিয়ে দোলন পীরের খাল এলাকায় কাঠ কাটতে যায়। বাবার চোখের সামনেই ছেলেকে বাঘে আক্রমণ করে।

বড় ছেলেকে বাঘ মুখে করে নিয়ে যেতে পারেনি। লাল মিয়া গাজী ও তার সঙ্গী-সাথীদের সাহসিকতা ও প্রতিরোধের কারণে বাঘটি ছেলের নিথর ছিন্নভিন্ন দেহ ফেলে রেখে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পর পরিবারটিতে শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে।

সুরুজ আলীর জন্মের আগের এ ঘটনা গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়।

ছোট্ট পরিবারটি একসময় শোক কাটিয়ে ওঠে। এর কয়েক বছর পর সুরুজ আলীর জন্ম। সুরুজ আলী কিছুটা বড় হয়। আট বছরের সুরুজ আলীকে বাবা-মা সব সময় চোখে চোখে রাখে।

লাল মিয়া গাজী কাঠ কাটতে এখন আর গভীর জঙ্গলে যায় না।

রেঞ্জ অফিস থেকে পাস সংগ্রহ করাও দুরূহ। বাঘের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় রেঞ্জ অফিস খুব সহজে পাস দিতে চায় না। পাস সংগ্রহ করতে পারলে অল্প কিছু কাঠ কেটে নৌকায় করে গ্রামের বাজারে নিয়ে আসে। এগুলো বিক্রি করে লাল মিয়ার পরিবারের অভাব-অনটনে কোনো রকমে দিন কাটে।

সুরুজ আলী পাশের গ্রামের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুব আদর করে। ভালো ছাত্র বলে সব সময় তার খোঁজ-খবর নেয়।

বাবার সাথে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যা হলেই বই নিয়ে পড়তে বসে। বাবা লাল মিয়া গাজীর এতে মেজাজ খারাপ হয়। ছেলেকে পড়তে দেখলে তার মাথায় আগুন ধরে যায়। কেরোসিন নষ্ট করে পড়ালেখা করার কোনো মানে হয় না। যে পরিবারের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাদের আবার পড়ালেখা কী? এসব তো অনেক বেশি স্বপ্ন!

কুপি জ্বেলে পড়ালেখা করার কারণে কেরোসিনের অপচয় হচ্ছে! বিদ্বান হওয়ার জন্য কেরোসিন নষ্ট করার কোনো দরকার নাই।—লাল মিয়া এমনটাই মনে করে।

তার চৌদ্দগুষ্টির মধ্যে পড়ালেখা নাই। অযথা এই ছেলেকে পড়ালেখা করিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে ছেলে যদি বাবার সাথে মাঠে গিয়ে কাজ করে এতেই অনেক লাভ।

সুরুজ আলীর মা এ নিয়ে স্বামীর সাথে তর্ক করে। ছেলে আর সবার মতো মূর্খ হোক এটা সে চায় না। তার ধারণা ছেলে একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। একটা মাত্র ছেলেই তো এখন বেঁচে আছে। ছেলেটার পড়ালেখায় এত আগ্রহ। বাবা হিসেবে তার মনের মধ্যে কি একটুও রহম জাগে না? লাল মিয়ার কি উচিত না ছেলেকে পড়ালেখার সুযোগ করে দেওয়া? কেরোসিনের দাম আর কতই বা! না খেয়ে থাকলেও ছেলেকে পড়ালেখা করাতে হবে। ছেলে একদিন বড় হয়ে চাকরি করবে। ঢাকায় থাকবে। তখন তাদের আর দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

স্ত্রীর এই স্বপ্নকে লাল মিয়া উচ্চাভিলাষী চিন্তাভাবনা বলে মনে করে।

লাল মিয়া তার স্ত্রীকে শোনায় :

বাইগুন সারা বছর হয় না—
গরিবের পড়ালেখা সয় না।

স্বামীর মুখে এমন কথা সুরুজ আলীর মা মালেকা বানুর মন খারাপ করলেও ছেলেকে পড়ালেখা শেখাবেই বলে জেদ ধরে।

সময় পার হয়। অভাব-অনটনে পরিবারটির দিন কাটে।

মাঝেমধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকে বাঘ-মানুষের লড়াইয়ের আতঙ্কের খবর চাউর হয়। কিছুদিন পরপর বাঘ-মানুষের দ্বন্দ্ব নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। বাঘের আক্রমণে কারও মৃত্যুর সংবাদ এলে গ্রামের মানুষের মনে বিষাদ ও আতঙ্কের ছায়া নামে।

এ গাঁয়ের কোল ঘেঁষেই সুন্দরবন। সন্ধ্যা হলে ডরে-ভয়ে কেউ খালপাড়ে যায় না। সেখানে প্রায়ই বাঘের পায়ের তাজা ছাপ দেখা যায়। রাত গভীর হলে বাঘ জঙ্গল থেকে খালে নেমে এসে পানি খায়।

ছোট্ট সুরুজ আলী চাঁদের আলোয় উঠোনে মায়ের কোলে শুয়ে বাঘের গল্প শোনে।

মুখে মুখে ছড়ানো রূপকথাগুলো ছোট্ট সুরুজ আলীকে বেশ অবাক করে।

এসব গল্পে তার আগ্রহ কম। মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা নিয়ে অনেক কিছু ভাবে। তারা এত উজ্জ্বল ও বড়-ছোট কেন? কোন তারার কী নাম এগুলো জিজ্ঞেস করে। মা তার পুত্রের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ঘুরে-ফিরে সে বাঘের গল্পই শোনাতে চায়।

সুরুজ আলী মাকে চাঁদের আলোর কথা জিজ্ঞেস করে, জোয়ার-ভাটার কথা জিজ্ঞেস করে। পুত্রের এসব কঠিন কঠিন প্রশ্ন মালেকা বানুকে লজ্জায় ফেলে দেয়। তার মনের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হয় ছেলে মেধাবী, একদিন অনেক বড় হবে।

লাল মিয়া গাজীর এসব ভালো লাগে না। তার স্ত্রী অতিরিক্ত আদর করে ছেলেটাকে নষ্ট করে ফেলছে। মালেকা বানু স্বামীর কথায় কর্ণপাত করে না। এক ছেলেকে বাঘে খেয়েছে, এই ছেলেকে সে বাওয়ালিগিরি করতে দেবে না। ছেলে যদি বড় হয়ে শহরে গিয়ে ভিক্ষা করে, তাতেও তার কোনো আপত্তি নেই। মায়ের মন বলে কথা।

লাল মিয়া গাজী স্ত্রীর মনের অবস্থা কিছুটা হলেও বোঝে। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে করে শরীরটাও সময়ের সাথে বিদ্রোহ করছে। ছেলের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার মতো টাকাপয়সা নেই। জঙ্গলের কাঠ বিক্রি করে কত টাকাই বা পাওয়া যায়! কোনো রকমে সংসার চলে।

অভাবের সংসার। ছেলের স্কুলের বেতন দেয়া তো দূরের কথা বই-খাতা কিনে দেয়ার পয়সাও নেই।

এসব ভেবে লাল মিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। স্ত্রীর সাথে আর বাগবিতণ্ডায় জড়ায় না। নিজের নরম মনের আবেগ লুকিয়ে রাখে। ছেলেকে দেখলেই হুংকার ছাড়ে—এত পড়ালেখা কইরা কী হইব? গরিবের আবার পড়ালেখা কী? সকালে আমার লগে কাজে যাবি। কালকা থেইকা তোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ।

পরদিন সকালে সুরুজ আলী বাবার সাথে মাঠে কাজ করতে যায়। স্কুলে যাওয়া বন্ধ। সুরুজ আলী অনুপস্থিত দেখে প্রধান শিক্ষক তাদের বাড়িতে আসে। অভাবের বিষয়-আশয় জেনে তিনি স্কুলে বিনা বেতনে সুরুজ আলীকে পড়ার সুযোগ করে দেন। লাল মিয়া হেডমাস্টারের কথা ফেলতে পারে না। সুরুজ আলীর আবার স্কুলের পড়াশোনা শুরু হয়। এভাবে বেশ কয়েকটি বছর কেটে যায়। ১৯৭২ সালের কথা। কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে কয়েক বন্ধুকে সাথে নিয়ে সুরুজ আলী সুন্দরবনের তৎকালীন বিখ্যাত শিকারি পচাব্দী গাজীর সাথে দেখা করতে তার বাড়ি যায়।

আঠারোবেকীর মানুষখেকোর শিকারকাহিনি শোনে। পচাব্দী গাজীর মুখে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা শোনে। সে সময়ের এক গুনিন কাঠ কাটার আগে জঙ্গলে বান দিতেন। জঙ্গল বান দেয়ার পর বাওয়ালিরা কাঠ কাটতে যেত। গুনিনের বানের ভরসা বাওয়ালিদের মনে বিশেষ বল এনে দিত। একদিন জঙ্গল বান দিয়ে গুনিন নিজেই বাওয়ালিদের সাথে কাঠ কাটতে যায়। গুনিন ধারণা করেছিলেন বনবিবি সন্তুষ্ট হয়েছে। বান দেয়ার কারণে বাঘ তাদের আশপাশে আসবে না।

অথচ গুনিনকেই সেদিন সবার চোখের সামনে নৌকার মাঝখান থেকে বাঘ তুলে নিয়ে যায়।

এ গল্প শোনার পর সুরুজ আলী পচাব্দী গাজীর কাছে কিছু যুক্তি তুলে ধরে!

দশম শ্রেণির পড়ুয়া সুরুজ আলীর যুক্তিকে উপস্থিত লোকজন বেয়াদবি বলে মনে করে।

সুরুজ আলী যুক্তি দেয়- বান দেয়া বলে কিছু নেই।

ঝাড়ফোঁক সবই ভণ্ডামি।

বাঘ বেঁচে থাকে মাংস খেয়ে। বুড়ো হয়ে গেলে বাঘ সহজে শিকার করতে পারে না। তখন অবলা মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘের চিন্তাশক্তি মানুষের মতো নয়।

মানুষের চিন্তায় যেটিকে বান দেয়া বলে, তা কেবলই মানুষের মনের তৈরি অদ্ভুত কিছু শব্দের জাল।

বাঘ এসবের কিছুই বোঝে না। বাঘের তাতে কিছু যায়-আসে না। আঠারোবেকীর মানুষখেকো বাঘের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। গুনিন নৌকার মাঝখানে একা বসে ছিল বলে বাঘের দৃষ্টি তার ওপরেই পড়ে। বাঘ তাকে টার্গেট করে সুযোগ খুঁজতে থাকে। সময় বুঝে ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে নৌকায় ওঠে গুনিনের ঘাড় কামড়ে ধরে। এর মধ্যে বাঘের কোনো সুপার পাওয়ার নেই।

সুরুজ আলীর এ ধরনের কথাবার্তা আশপাশের লোকজনকে খুবই বিরক্ত করে।

পচাব্দী গাজীর চাচাতো ভাই ইসমাইল গাজী এ কথা শুনে ভীষণ বিরক্ত।

পচাব্দী গাজী সুরুজ আলীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তিনি বলেন- বাবা, অনেক বড় হও। তোমার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ পাক তোমারে জ্ঞান দিছেন। ছোট্ট মানুষ তুমি, তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি আমারে অবাক করছে। অনেক দোয়া তোমার জন্য।

সুরুজ আলী বন্ধুদের নিয়ে গাঁয়ে ফিরে আসে।

দু-একজন বন্ধু সুরুজ আলীর যুক্তিগুলো সঠিক বলে মনে করে।

তাদের মধ্যে খোদাভীরু ও নামাজি বন্ধুটি তার কথাকে বেশ গুরুত্বের সাথে নেয়। সুরুজ আলীর যুক্তির মধ্যে বন্ধুটি আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা জড়িয়ে দিতে চায়।

সুরুজ আলী তাতে বাধ সাধে। বন্ধুদের সাথে সুরুজ আলীর এ কথোপকথন লাল মিয়া গাজী পাশের ঘর থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনে। মনে মনে ছেলের কথাকেই বিশ্বাস করে।

আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহপাক যেন তার ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে। অনেক শিক্ষিত করে।

সুরুজ আলীর সামনে টেস্ট পরীক্ষা। ফিজিক্সের শেষ ক্লাস। এ ক্লাসে শিক্ষকের সাথে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রের সমীকরণ $F = kma$ নিয়ে তর্ক জুড়ে দেয়।

সুরুজ আলী তার স্যারকে বলে, স্যার, যদি এই দ্বিতীয় সূত্রে সমানুপাতিক ধ্রুবক K-কে একক না ধরি তখন কী হবে?

সুরুজ আলীর এ প্রশ্নে শিক্ষক হতভম্ব।

বিরক্তির সাথে বলে, তুমি নিউটনরে গিয়া জিগাও!

সুরুজ আলী বলে, স্যার, আমি আর আপনে বাইসাইকেল চালাইতেছি। ধরেন আমার সাইকেলে একটা বস্তা আছে। আপনের সাইকেলে যেই শক্তিতে প্যাডেল দিতাছেন আমিও আমার সাইকেলে একই শক্তিতে প্যাডেল দিতাছি। আমার গতি আর আপনের গতি সমান হইব না। আপনের সমান গতির সাইকেল চালাইতে গেলে আমারে আরও বেশি শক্তি দিয়া প্যাডেল মারতে হইব। এইটাই তো নিউটন এই সূত্রে বলতে চাইছে।

শিক্ষক বিরক্ত হন। তিনি বলেন, তুমি কি এই উদাহরণ মনে মনে বানাইলা? নিজেরে এত বেশি পণ্ডিত ভাবো কেন?

সুরুজ আলী বলে, না স্যার, আমার উদাহরণটা সঠিক হইছে কি না এইটাই জানতে চাই।

শোনো, এত বেশি কথা বলবা না, বইয়ে যেই উদাহরণ দেওয়া আছে সেইটা লেখবা। বেশি লেখতে গেলেই নম্বর পাইবা না। দাওয়ের থেইকা আছাড় বড় হওয়া ভালো না।

টেস্ট পরীক্ষায় সুরুজ আলী ফিজিক্সের এ প্রশ্নের উত্তর নিজের মতো করে বানিয়ে দেয়। নিজের বানানো সাইকেলের এ উদাহরণ লিখে দেয়। শিক্ষক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার খাতা দেখে। সুরুজ আলীকে কম নম্বর দেয়।

সুরুজ আলী মন খারাপ করলেও মেট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন ও ফিজিক্সে লেটার মার্কস পায়।

পড়াশোনা চলতে থাকে।

স্কুলের হেডমাস্টারের রেফারেন্সে সুরুজ আলী খুলনা শহরের বয়রা এলাকার একটি বাড়িতে লজিং চলে আসে।

খুলনার স্বনামধন্য কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়।

এ সময় তার বাবার মৃত্যু হয়।

সুরুজ আলীর মায়ের দেখাশোনা করে তার প্রতিবেশী এক চাচা।

সুরুজ আলী পড়াশোনার পাশাপাশি খুলনা শহরে পুরোদমে টিউশনি শুরু করে। নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে গণিত ও বিজ্ঞান পড়ায়। মাস শেষ হলে মার কাছে টাকা পাঠায়।

মাঝেমধ্যে গিয়ে মাকে দেখে আসে।

ইন্টারমিডিয়েটে ভালো রেজাল্ট করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে ভর্তি হয়। তার কথাবার্তায় সহপাঠীরা তাকে মেধাবী ভাবতে শুরু করে। সে ওই ব্যাচের সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যমণি হয়ে ওঠে। ফিজিক্সের কঠিন কঠিন সব অঙ্কের সমাধান দ্রুত করে ফেলতে পারে।

অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় সুরুজ আলীর সাথে তার ক্লাসমেট রেবেকার বন্ধুত্ব তৈরি হয়।

মায়াবী চেহারার মেয়ে। মায়ের সাথে তার চেহারার আদলে বেশ মিল। লম্বা সুদর্শনা। রেবেকা ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রিয় মুখ। রেবেকার সাথে ধীরে ধীরে তার বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়ে ওঠে।

রেবেকা সুরুজ আলীর বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় মুগ্ধ হয়।

দুজনে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি কিংবা পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে একসাথে পড়াশোনা করে।

কসমোলজি নিয়ে সুরুজ আলীর গভীর আগ্রহ দেখে রেবেকা তাকে কসমোলজির ওপর উচ্চতর পড়াশোনা করার পরামর্শ দেয়। দুজনের এই গভীর বন্ধুত্ব একসময় সহপাঠীদের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুরুজ আলী তার কোনো কিছুই গোপন করে না।

সুরুজ আলীর পরিবারের খবরাখবর রেবেকাকে মর্মাহত করে। সুরুজ আলী ও রেবেকার পরিবারের স্ট্যাটাসের আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এ ব্যবধান দুজনের বন্ধুত্বে কোনো ফাটল তৈরি করে না। রেবেকার বাবা সে সময়ের রিটায়ার্ড সচিব। একসময়ের জাঁদরেল সিএসপি অফিসার। বনেদি পরিবারের মেয়ে রেবেকা। ৮২ মডেলের ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। সবাই চোখ বড় বড় করে দেখে।

চতুর্থ ডাইমেনশন। পৃথিবীর মতোই দেখতে এ গ্রহটি যেন পৃথিবীরই জোড়া। এখানে রাত বেশ গভীর। আকাশে উজ্জ্বল সব তারারা রাজত্ব করে চলে। এই উজ্জ্বল তারাগুলো রাতের আকাশের কালো বসনে লম্বা ও স্পষ্ট ফাটল তৈরি করেছে। শান্ত মনে তারা মিয়া নামের চতুর্থ ডাইমেনশনের এক যুবক রাতের আকাশের গায়ে তারাদের গভীর ফাটলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ৪০ ছুঁই ছুঁই বয়সে নিজেকে এ মুহূর্তে ভারমুক্ত লাগছে। নিজ বাড়ির উঠোনে চেয়ার পেতে বসে আছে।

দুঃখ, কষ্ট ও জটিল জগতের ঊর্ধ্বে তার অস্থির মনে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। মন ভালো হয়। খানিক বাদে আকাশের দক্ষিণ দিকে অচেনা কোনো নক্ষত্রের পতন দৃষ্টি গোচর হতেই আবারও জাগতিক চিন্তায় পড়ে যায়। পার্টিকেল ফিজিক্সের ওপর উচ্চতর গবেষণা প্রোগ্রাম থেকে ড্রপআউট হওয়ার

পর বেশ কিছুদিন মনে কষ্ট নিয়ে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে। তার সাবমিট করা গবেষণা নিয়ে বড় বড় সায়েন্টিস্টের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়। শোরগোল পড়ে বিজ্ঞানী সমাজে। তারা মিয়া অধিকাংশের রোষানলে পড়ে যায়। সবাইকে ব্ল্যাক হোল তৈরী প্রয়োজনীয়তার মূল কারণটি বোঝাতে ব্যর্থ হয় সে। উপায়ন্তর না পেয়ে মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে আসে নিজ বাড়ি।

তাদের এ গ্রামটি বেশ নিরিবিলি। বাড়ির পাশ দিয়েই একটি ছোট খাল অদ্ভুত বাঁক খেয়ে এঁকেবেঁকে দূরের নদীতে গিয়ে মিশেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সব সার্ডিন ফিশ পানির উপরিতলে গোত্তা খেয়ে আবার ডুবে যায়। বসন্ত সমাগত। তারা মিয়ার আশপাশে কেউ নেই। মন খুলে কথা বলার লোক পাওয়াও বেশ কঠিন। এ সময়গুলোতে তারা মিয়া তার মৃত মা-বাবাকে ভীষণ মিস করে।

চারদিকে সবুজের সমারোহ। এই গ্রামের সব লোক কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে! এর রহস্য কে ভেদ করবে! তারা মিয়ার বাল্যকালের বন্ধু এখন ভীষণ ব্যস্ত। এ গ্রামে তার কথা বলার কোনো লোক নেই। বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে দূরে অল্প কিছু লোকের বসবাস। তারা মিয়ার একাকিত্ব খুব ভালো লাগে।

পার্টিকেল ফিজিক্স বা কণা পদার্থবিদ্যা নিয়ে তার রিসার্চ পেপারটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনে অকারণে রোষ তৈরি করেছে। কোয়ান্টাম ফিল্ড মেকানিজমের এস্টাবলিশড সব থিউরিকে তারা মিয়া কেন অদ্ভুত সব গাণিতিক ব্যাখ্যায় ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছে তা বুঝতে পারেনি বড় বড় পদার্থবিদেরা। ব্ল্যাকহোল তৈরি করে বিপদ ডেকে আনার কারণ কী? তারা মিয়াকে সবাই চতুর্থ ডাইমেনশনের ক্ষতিকর কিছু একটা ভেবে বসে আছে।

মনে ক্ষোভ নিয়ে নিজ বাড়ি ফিরে আসার পর পার্টিকেল ফিজিক্সের একটি গবেষণাগার তৈরির অদ্ভুত পাগলামি মাথায় ঘুরপাক খায়। উঠোনের পেছন দিকটায় ২০ বর্গমিটার জায়গায় শক্তিশালী এক্সিলারেটর টিউব, কলিশন চেম্বার এবং ছোট আকারের অসংখ্য সব শক্তিশালী কোয়ান্টাম ম্যাগনেট দিয়ে একটি ছোট ব্ল্যাকহোল তৈরির যন্ত্র অর্থাৎ স্মল হেড্রন কলিডার তৈরির চেষ্টা করে। বিভিন্ন স্থান থেকে অগণিত কোয়ান্টাম চুম্বক সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয় তাকে। অনেক টাকা খরচ করে এ গবেষণাগারে। অন্তহীন চেষ্টার পর অবশেষে স্মল হেড্রন কলিডার তৈরি করে।

আজ সেই শুভক্ষণ। তারা মিয়া প্রোটন নামের কণিকাগুলোকে উচ্চগতিতে একবার ঘড়ির কাঁটার দিকে, আরেকবার ঘড়ির কাঁটার বিপরীত

দিকে ক্ষুদ্র পরিসরে পরিমিত মাত্রার পারমাণবিক শক্তি খরচ করে আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে পরিচালন করে। এ সময় বিপরীতমুখী প্রোটন বিমগুলো কলাইড করার পর অদ্ভুত কিছু একটা তৈরি হয়। এ স্মল হেড্রন কলিডারের বিউটি ডিটেক্টর নামক অংশটি কিছু অ্যান্টি-ম্যাটারের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অতি শক্তিশালী সেন্সরে এ বিষয়গুলো ধরা পড়ে। এ যন্ত্রের ফরোয়ার্ড ডিটেক্টর অংশটুকু এসব বিষয় নিশ্চিত করে।

একসময় তারা মিয়া বুঝতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তার সে প্রেডিকশনই সঠিক। তার এই রিসার্চ সেন্টারে খুব ছোট আকারের ব্ল্যাকহোল তৈরি হয়েছে। তারা মিয়া ভয়ে ব্ল্যাকহোলে হাত দিচ্ছে না। সৃষ্ট ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজন তো নিশ্চয়ই আছে। ইভেন্ট হরাইজন মানে ব্ল্যাকহোলের মরণ টানের বিশেষ সীমানা যদি এখানে থাকে, তাও ক্ষতির কারণ হয় কি না কে জানে!

এ ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজন যেটুকু তৈরি হয়েছে তা পৃথিবীর জন্য সেইফ। তারা মিয়া এভাবে আন্দাজ করে। কোয়ান্টাম গ্লাসের তৈরি স্পেশাল প্রটেক্টরের ভেতর ব্ল্যাকহোলটি রেখে দেয়।

পার্টিকেল ফিজিক্সের নতুন দ্বার কি উন্মোচন হলো? নাকি ধ্বংসের এক মহাযজ্ঞ তৈরি করে ফেলেছে তারা মিয়া! উত্তেজনা ও ভয়ে কাঁপতে থাকে। উঠোনে গিয়ে চেয়ার পেতে আকাশের তারা দেখে। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণপক্ষের এ রাতে তারা মিয়া হেঁটে হেঁটে উঠোন পার হয়ে ঢালু জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। শাখাপথ পেরিয়ে একসময় মূল সড়কে গিয়ে ওঠে।

কতকাল ধরে এই একই পথ দেখছে তা সে জানে না।

এসব ভাবতে ভাবতে তারা মিয়া রাস্তার ধারে বড় আপেল গাছটির নিচে গিয়ে দাঁড়ায়।

ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকা এদিকে-ওদিকে ওড়াউড়ি করছে।

নিকষ কালো আঁধারে জোনাকির ঝাঁক দেখে মনে হয় আকাশের সব তারা যেন নেমে এসেছে।

তার পরনের শার্টে দু-চারটা জোনাকি পোকা উড়ে এসে বসে।

তারা মিয়া কিছু জোনাকি পোকা হাতের মুঠোয় নেয়।

এ সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তার সামনে একটি আলোকস্ফুলিঙ্গ কখনো জ্বলে আবার নেভে। উপরে ওঠে কখনো বা নিচে নামে। তারা মিয়া ঘাবড়ে যায়। অশরীরী কিছু না তো!

মনে সাহস নিয়ে বলে—আপনি যদি অন্য কোনো শক্তি হয়ে থাকেন এবং আমার কথা শুনতে পান, তবে নিজস্ব অবয়বে আমার সামনে এসে দাঁড়ান।

তারা মিয়া তার চোখে চশমার ডান দিকের ফ্রেমের সাথে সংযুক্ত শক্তিশালী কোয়ান্টাম প্রসেসর অ্যাকটিভ করে।

চশমার মনিটরে ভেসে উঠে সবকিছু। সামনে উপস্থিত এই আলোকতরঙ্গের কোনো ব্যাখ্যা চশমার মনিটরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে থাকে। কপালে চিকন ঘাম দেখা দেয়।

আলোর বিচ্ছুরণটি একটু একটু করে বড় হতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ এক সুন্দরী মেমসাহেবের রূপে দাঁড়ায় তার সামনে। অসম্ভব সুন্দরী তরুণী। আঁটোসাঁটো পোশাক। স্বর্ণকেশী। জ্বলজ্বল করে ওঠে তার চোখ। তারা মিয়া আন্দাজ করে মেয়েটি উচ্চতায় তার মাথায় মাথায় সমান।

তারা মিয়া বলে– আপনি কে?

তারা মিয়ার চোখে চোখ রেখে মেয়েটি উত্তর দেয়– নাইস টু মিট ইউ মিস্টার তারা মিয়া।

তারা মিয়া উত্তর দেয়– সেইম টু ইউ!

মেয়েটি বলে– মিস্টার তারা মিয়া, আমি আলভী ওয়ান! এই জগতের নই। এসেছি সপ্তম ডাইমেনশন থেকে।

তারা মিয়া বিস্মিত! বলে– এও কি সম্ভব? সপ্তম ডাইমেনশন বলতে কিছু আছে নাকি? স্ট্রিং থিয়োরি কি তাহলে সত্যি? মাল্টিভার্স কি তাহলে সত্য?

আলভী ওয়ান উত্তর দেয়– অবশ্যই সত্য। আমাকে দেখো, আমিই তো তার প্রমাণ।

তুমি আমাকে খুঁজে পেলে কীভাবে? কেনই বা এসেছ?

সাহেব, তুমি এত সুন্দর একটা ব্ল্যাকহোল তৈরি করেছ। আমি কোয়ান্টাম সিগন্যালে সে তথ্য পেয়ে সপ্তম ডাইমেনশন থেকে তোমাকে দেখার জন্য চলে এসেছি।

তারা মিয়া বলে– আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

ভয় লাগার কোনো কারণ নেই। তুমি আমাকে দেখে ভেতরে ভেতরে অভিভূত। এসো, তোমাকে জড়িয়ে ধরি, তাহলে ভয় কেটে যাবে।

এ কথা শেষ করে আলভী ওয়ান হাসতে থাকে। এ হাসি যেন তারা মিয়াকে দূরের কোনো রোমাঞ্চকর জগতের আশ্চর্য সমুদ্রে স্নান করার হাতছানি দেয়।

আলভী ওয়ান বলে– তোমার ক্ষতি করতে আসিনি বরং রিসার্চে সহযোগিতার জন্য এসেছি।

আমার কাজ করে তোমার লাভ?

শুধু আমার লাভ না, এটা সব ডায়মেনশনের জীবন্ত বস্তুর জন্য মঙ্গলজনক। তুমি এক ডাইমেনশন থেকে অন্য ডাইমেনশনে যাওয়ার ব্যাপারে আমার কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারো। আশা করি, রিসার্চ চালিয়ে গেলে তুমি শিগগিরই ডাইমেনশনগুলোর পথ পেয়ে যাবে।

তারা মিয়া বলে– সত্যি করে বলো তো তুমি কি জীবন্ত?

আলভী ওয়ান হেসে উত্তর দেয়– নিশ্চয়ই আমি জীবন্ত। ছুঁয়ে দেখো!

তারা মিয়া আলভী ওয়ানকে ছুঁয়ে দেখে। তার উষ্ণতা যথেষ্ট।

তারা মিয়া বলে– তুমি এত উষ্ণ কেন?

আলভী ওয়ান বলে– আমার ভেতরে ইলেকট্রন মডিফাই হয়ে রিজেনারেট হচ্ছে। তাই এ মুহূর্তে আমি উষ্ণ।

এটা কি জীবন্ত বস্তুর বেলায় আদৌ সম্ভব?

আলভী ওয়ান বলে– অবশ্যই সম্ভব। আমি সপ্তম ডাইমেনশনের। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। আমি খুব সহজে তোমার জগতে চলে এসেছি। আবার তৃতীয় জগতে যেতে পারি। কিন্তু তুমি তা পারবে না। যতক্ষণ না তুমি ডাইমেনশনগুলোর পথ খুঁজে পাচ্ছ। ঊর্ধ্বজগত বা ডাইমেনশন থেকে নিচে যাওয়া যায়, কিন্তু নিচের জগৎ থেকে ঊর্ধ্বজগতে যাওয়া যায় না। বিশেষ গেইটওয়ে লাগবে।

তারা মিয়া বলে– আমি কি তৃতীয় ডাইমেনশনে যেতে পারব? আলভী ওয়ান বলে– না। সেটার পথ তুমি কখনো জানবে না। আমার হেল্প লাগবে।

এ কথা শেষ করে আলভী হাসে। আলভীর আকর্ষণীয় হাসি তারা মিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে। এক দৃষ্টিতে আলভীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভালো লাগার অবিনাশী দ্যোতনা কোন বীণায় তার হৃদয়ে বাজে, তা আঁচ করতে পারে না সে।

তারা মিয়া, তুমি কোন ডাইমেনশনে তা কি তুমি জানো?

তুমিই বলো আমি কোন ডাইমেনশনে আছি?

আমি বলব না। তুমি নিজেই তার উত্তর পেয়ে যাবে। এত বড় একজন রিসার্চার যদি এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিষয়টা হাস্যকর।

তারা মিয়া কিছু বোঝে না। একটু ভাবে। এরপর বলে– আমি তোমার হাতটা আবার একটু ছুঁয়ে দেখি?

কথা শেষ করে আলভী ওয়ানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

আলভী ওয়ান তারা মিয়ার হাতে হাত রাখে। চোখ বন্ধ করে আলভী ওয়ান বলে– আমার শরীরের ইলেকট্রনগুলো তোমার শরীরে চলে যাচ্ছে। তুমি কি কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট বোঝো?

তারা মিয়া হেসে বলে– বুঝব না কেন? দূরত্ব যাই থাকুক না কেন দুটো কণার পারস্পরিক মায়ার বাঁধন ও যোগাযোগ। এটা কনাদের প্রেম!

আলভী ওয়ান হাসে। বলে–তাহলে আমার নাম আলভী ওয়ান কেন তাও নিশ্চয়ই বোঝো?

তারা মিয়া মাথা চুলকায়। বলে– আলভী টু বলতে কিছু আছে কি? সে কি তাহলে তোমার ইলেকট্রনের জোড়া? আলভী টু কি দেখতে একেবারে তোমার মতোই? তাহলে সে কোথায়?

আলভী ওয়ান বলে– এতগুলো প্রশ্নের উত্তর এখন কী করে দিই? ছোট্ট করে বলি, আলভী টু এখন ষষ্ঠ ডাইমেনশনে আছে। আলভী টুও জেনে গেছে তুমি ব্ল্যাকহোল তৈরি করেছ।

তারা মিয়া বলে– খুব অল্প পরিমাণের ইভেন্ট হরাইজন পেয়েছি। ওয়ার্মহোল এখনো পাইনি।

আলভী ওয়ান বলে– আমার কাছ থেকে যাওয়ার পর ছোট্ট ওয়ার্মহোল পেয়ে যাবে। এটিকে স্পর্শ করবে, ডিভাইস সেট করবে এবং ওখান থেকে তুমি থার্ড ডাইমেনশনের বেশ কিছু অতীতের সময় ঘুরে আসতে পারো। তাহলে তুমি নিজেই বুঝবে এখন কোন ডাইমেনশনে আছো।

কীভাবে সম্ভব?

তোমাকে টেলিপোর্টেশনের রোডম্যাপ, নেভিগেশন ডেটা সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস ও ডিটেইলস দিয়ে দিচ্ছি। তুমি কোয়ান্টাম ডিটেক্টটর দিয়ে দেখলে ছোট ব্ল্যাকহোলে কিছু অদ্ভুত স্পেস দেখতে পাবে। আমার দেয়া ডিভাইসগুলোর সাথে সমন্বয় করে নিও। ওয়ার্মহোল তৈরি হয়ে যাবে। টাইম ট্রাভেল শুরু করতে পারবে তখন। ওখান থেকেই ওয়ার্মহোল হয়ে যাত্রা শুরু করতে পারবে। তৃতীয় ডাইমেনশনের গেইটওয়ে পেয়ে যাবে। গেটওয়ে ডিরেকশন দিয়ে দিলাম। এটি ব্যবহার করে তৃতীয় ডাইমেনশনের বিখ্যাত কিছু সায়েন্টিস্টদের অতীতকালে মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।

পৃথিবী থেকে ঘুরে আসো। আবার দেখা হবে।

আমার আগমনের একটাই উদ্দেশ্য– তোমাকে উৎসাহ দেয়া।

এর বেশি কিছু নয়?

আলভী ওয়ান হেসে বলে–তুমি কি আরও কিছু চাইছো? আশ্চর্য, প্রথম সাক্ষাতেই এ অবস্থা! আমাকে নিয়ে এত কিছু ভাবছো?

তারা মিয়া উত্তর দেয়–সেপিওসেক্সুয়াল ধরনের কিছু একটা ভাবছি।

আলভী ওয়ান রাগ করে। বলে– তুমি বাজে কথা বলছো। খুব মেধাবী হলেও তুমি দুর্বল চরিত্রের। সৌন্দর্য দেখে কাবু হওয়া লোক।

কথা শেষ করে আলভী ওয়ান দুই কদম এগিয়ে এসে তারা মিয়ার ঠোঁটের কাছে ঠোঁট রাখে। কয়েক মুহূর্ত এভাবেই থাকে, এরপর ঠোঁট কিছুটা সরিয়ে নেয়। কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলে– নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কি?

তারা মিয়ার চোখ বন্ধ। নীরব হয়ে থাকে। আলভী ওয়ান বলে–ধন্যবাদ তোমাকে। আমার উষ্ণতা অনুভব করেছ?

হ্যাঁ, করেছি।

এখানে সময় নষ্ট না করে গবেষণাগারে ফিরে যাও।

মুহূর্তের মধ্যে অ্যালভী ওয়ান অদৃশ্য হয়ে যায়।

## দুই

সুরুজ আলী জ্বরে আক্রান্ত। সপ্তাহখানেক ধরে ক্লাসে যাচ্ছে না। হলের ১১৭ নম্বর রুমে শুয়ে-বসেই দিন কাটাচ্ছে।

রাত হলে জ্বর বাড়ে। সন্ধ্যার পর রুমের জানালা খোলা রাখা দায়। দিনের বেলায়ও একই অবস্থা। উত্তরের শীতল বাতাস হু হু করে ঢুকে পড়ে। ডিসেম্বরের শুরুতেই বেশ শীত পড়েছে।

তীব্র জ্বরের মধ্যে হাড় কাঁপানো শীতের ছোবলে সুরুজ আলীর দাঁতে দাঁত বাড়ি খায়। কাঁথাটা শরীরে জড়িয়ে কোনোরকমে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। হলুদ খামের চিঠিটি হাতে নেয়। মা পাঠিয়েছেন। মায়ের চিঠি খুলে পড়তে শুরু করে। বাবার শোকে মা এখনও মুহ্যমান। বাবা গত হয়েছেন প্রায় দুই বছর হলো। মা সে শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এর মধ্যে সুরুজ আলী কয়েকবার সাতক্ষীরায় বাড়ি গিয়েছে। পড়াশোনা ও টিউশনির কারণে ফিরে আসতে হয়েছে দ্রুত।

এবারের চিঠি মা কড়া ভাষায় লিখেছেন। মা লিখেছেন– আমি মইরা গেলে তুই কি আমার কবর দেখতে আইবি? সুরুজ আলী চিঠি পড়ার পর মায়ের কাছে যাওয়ার তাড়া অনুভব করে। নিয়ত করে এবার বাড়ি গিয়ে বেশ কিছু দিন থেকে আসবে। মায়ের মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক ধরনের চেনা অনুভূতি কাজ করে। মনে হয় মা তার পাশেই বসে আছেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এসব ভেবে শরীর ঘামতে শুরু করে। শরীর থেকে কাঁথা সরিয়ে দেয়। এক গ্লাস পানি খায়। হাতমুখ ধুয়ে নেয়। জ্বর কমতে শুরু করে।

মানুষের মনের সাথে শরীরের নিবিড় যোগাযোগ। মন ভালো হলে শরীর সেরে ওঠে। মায়ের চিঠিখানি যেন টনিকের মতো কাজ করেছে সুরুজ আলীর এই সময়ে। পরনের কাপড় পাল্টে পরিপাটি হয়ে পাবলিক লাইব্রেরির দিকে